‘বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি’-র উদ্বোধনী দিনে, পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক কর্তৃক প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ।

হোটেল ইম্পেরিয়াল কনভেনশন সেন্টার
৩৩-৩৪ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

মঙ্গলবার ০৪ ডিসেম্বর ২০০৭

‘বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি’-র উদ্বোধনী দিনে, পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক কর্তৃক প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ।

কোরআন তেলাওয়াত (সুরা ফাতেহা)
দুই জন তরুণ-তরুণী কর্তৃক কবি গোলাম মোস্তফার কবিতা আবৃত্তি। কবিতার নাম ‘প্রার্থনা’। এই কবিতাটি পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা, সুরা আল ফাতিহার কবিতা আকারে বাংলা অনুবাদ।

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী
যত গুণগান হে-চির মহান, তোমারি অন্তর্যামী।
দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া, তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি আকাশে যাচি হে শকতি, তোমারি কর“ণাকামী।
সরল সঠিক পূণ্য পন্থা, মোদের দাও গো বলি
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি।
যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ, যে-পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদের কখনও করোনা সে পথগামী।

আজকের এই মহতি সভায় আগত সুধীবৃন্দ, দূর-দুরান্ত থেকে আগত সকল ধর্মের, বিবিধ রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতা ও কর্মীবৃন্দ, অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তিবর্গ, তর“ণ-তর“ণী এবং ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ।।। একজন মুসলমান হিসেবে আমি আপনাদেরকে আমার মত করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল- াহ্। যার যার ধর্ম ও অনুভূতি মোতাবেক আমার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর“ন। বিভিন্ন দেশের দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা থেকে আগত বিদেশী মেহমানবৃন্দ সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। (ডিসটিংগুইস্ড ফরেন গেষ্টস, এক্সসিলেনসিস, গ্রিটিংস টু ইউ)।

আজ ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার ঢাকার হোটেল ইম্পেরিয়ালে আমরা আপনাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি একটা উদ্দেশ্যে। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য একটি নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেওয়া। একটু পরেই ইনশাআলণ্টাহ্ ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ঘোষণা দিব। তার পূর্বে অল্পকিছু ব্যাখ্যা দিতেই হবে। কেন রাজনৈতিক দলটির প্রয়োজন হলো বা কেন আমিই ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিতে এলাম এবং ঐ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য কি হতে পারে সে প্রসঙ্গে আমরা বলবো। আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি মহান সৃষ্টিকর্তা পরম কর“ণাময় আল- াহ্তালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে তিনি আমাদেরকে এখানে আসার সুযোগ দিয়েছেন। কিছুদিন পূর্বের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’-এ যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমি শোক জ্ঞাপন করছি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিজয়ের মাসের চতুর্থ দিনে আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি। আমি জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিও সম্মান জানাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নির্যাতিত, নিপিড়ীতি সকল জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতকে তথা মিডিয়া জগতকে। আমি মুদ্রণ মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানাবো যারা আমার অবসর জীবনের ১১টি বছরে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে লেখার সুযোগ দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমি আমার চিন্তা, বক্তব্য এবং অনুভূতিকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। আমি আরো ধন্যবাদ জানাবো সরকারি ও বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে যারা গত পাঁচ বছর যাবৎ, বিশেষ নিবিড়ভাবে গত তিন বছর যাবৎ, আমাকে সুযোগ দিয়েছেন টেলিভিশনের মাধ্যমে আমার বক্তব্য, চিন্তাধারা ও কথাগুলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে। সব সময় চেষ্টা করেছি সমসাময়িক বিষয়ে সরল মনে, খোলা মনে, স্পষ্টভাবে কথাগুলো বলতে। আমাকে যদি মিডিয়া সুযোগ না দিত তাহলে আমার কথা, অনুভূতি ও চিন্তা জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারতো না। তাই আমি দ্বিতীয়বারের মত বলছি, মিডিয়া জগতের কর্মীদের ও মিডিয়া জগতের প্রবীণ ও নবীণ সকল ব্যক্তিদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আগামী দিনগুলোতেও আমি আপনাদের নিকট থেকে সহযোগিতা কামনা করছি। সার্বিকভাবে আজকের আমি যে স্থানে আছি তার জন্য পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মহান আলণ্টাহ্র প্রতি।

আজকে একটি বিশেষ দিন আমার জীবনের জন্যেও। আমার জন্ম ১৯৪৯ সালে, আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করি ১৯৭০ সালে, মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি ১৯৭১ সালে, বাধ্যতামূলক অবসরে গিয়েছি ১৯৯৬ সালে। জীবনে শিশু বয়স থাকে, কৈশর থাকে, যৌবন থাকে ও কর্মজীবন থাকে। আমার পেশাদারি কর্মজীবন শেষ হয়েছে ১৯৯৬ সালে। নতুন কর্মজীবন ১৯৯৬ সাল থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০০৭ সাল পর্যন্ত। আজ ৪ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে অতীতের সকল পরিচয়ের সঙ্গে নতুন পরিচয় যুক্ত হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনের একজন কর্মী হিসেবে। এতদিন রাজনীতি সচেতন নাগরিক ছিলাম, রাজনৈতিক বিশেণ্ডষক ছিলাম, কিন্তু আজ থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ করছি। আমি নবাগত, তাই আজকের এই দিনে আমি বাংলাদেশের জীবিত সকল প্রবীণ অভিজ্ঞ জনসেবক রাজনীতিবিদগণের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি, তাদের দোয়া কামনা করছি, তাদের আশীর্বাদ কামনা করছি। আমার চলার পথে তাদের অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগবে। দলমত নির্বিশেষে যিনি প্রবীণ, যিনি অভিজ্ঞ, যিনি জনপ্রিয়, যিনি জনসেবক, যিনি বিবেকবান তিনিই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনীতির শিক্ষক, আমি তার ছাত্র হব। যুগপৎ, নিজে আমার সহকর্মীদের নিকট বড় ভায়ের মত, শিক্ষকের মত, পিতার মত নিজেকে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করবো। সেই প্রেক্ষাপটে যারা আমার সহকর্মী এবং কনিষ্ঠ হবেন তাদেরও দোয়া চাই, তাদেরও ধৈর্য-মি"ত সহযোগিতা চাই, এই প্রার্থনা আমি রাখলাম।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রধান বা অ-প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নাম সকলেই জানেন। এতদ্সত্ত্বেও একটি নতুন রাজনৈতিক দল কেন ঘোষণা করতে যাচ্ছি? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের ঘোষণাপত্রের প্রথম চার পৃষ্ঠায় আছে। তার অতিরিক্ত কিছু কথা এখানে বলছি।

আমরা ১৯৪৯ সালে ফিরে যাই, আজ থেকে ৫৮ বছর পূর্বের কথা। যেই রাজনৈতিক দল বৃটিশ-ভারতের হাত থেকে নতুন দেশ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল, তার নাম ছিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ। সেই পাকিস্তান মুসলিম লীগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, পাকিস্তান স্বাধীনতার বাইশ মাসের মাথায় কেন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক দলের প্রয়োজন হয়েছিল? ২৩ জুন ১৯৪৯ সালে বিকাল বেলা তৎকালীন ঢাকা নগরীর 'রোজ গার্ডেন' -এ তৎকালীন মুসলিম লীগের কর্মীদের বিদ্রোহী গ্র"পের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান। ঐ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থিত প্রায় তিনশত প্রতিনিধির সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয় পূর্ব-পকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সভাপতি হন মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে চলিণ্ডশ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদের নাম ঘোষণা করনে। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, ঐ সম্মেলন উপলক্ষে 'মূলদাবী' নামক পুস্তিকা উপস্থাপন করেন। ঐ পুস্তিকায় তথা শামসুল হকের বক্তব্যের একাধিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

"ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলণ্ডাহ শুধু মুসলমানের নয়—জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের। রবই আলণ্ডাহ্র সত্যিকার পরিচয়। রব হিসেবে রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব পালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। ...
নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কখনও দল [গোষ্ঠী] বিশেষের প্রতিষ্ঠান ছিল না; ইহা ছিল ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জাতীয় পণ্ডাটফর্ম বা মঞ্চ। ইহার উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, পাকিস্তানের মূল নীতিগুলিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন নূতন চিন্তাধারা, নূতন নেতৃত্ব এবং নূতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী এবং মুসলিম লীগকে মুসলিম জনগণের সত্যিকার জাতীয় পণ্ডাটফর্ম বা মঞ্চ হিসেবে গড়িয়ো তোলার।...
কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান পকেট লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া তাঁহাদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য লীগের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ভাঙ্গাইয়া চলিয়াছেন।...
পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন মনে করে যে, মুসলিম লীগকে এইসব স্বার্থন্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির কারিয়া সত্যিকারের জনগণের মুসলিম লীগ হিসেবে গড়িয়া তুলিতে ... হইবে।" (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, পৃ-৩৭)।

অতএব উপরের উদ্ধৃত অংশ থেকে যে সারমর্ম পাই সেটি হচ্ছে মুসলিম লীগকে তথা রাজনীতিকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল এবং সেটাই ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রথম বিরোধী দল।

আনুমানিক পাঁচ বছর পর, পুর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এক পর্যায়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং অন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতায় আসে। কিছু দিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ-এর তৎকালীন প্রখ্যাত নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে উপেক্ষা করেন এবং পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে নিবিড়ভাবে মার্কিন ঘেষা করে ফেলেন। এটা আওয়ামী লীগের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ঐ নীতিকে মেনে নিচ্ছিলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও আওয়ামী লীগ-এর ভিতরেই বিদ্যমান তার অনুসারীগণ। তাছাড়া, আওয়ামী লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদগুলো পুরণে ব্যর্থ হচ্ছিল বা অনেক ক্ষেত্রেই ওয়াদার পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ করছিল। ঐ পেক্ষাপটেই ১৯৫৬ সাল ব্যাপী এবং ১৯৫৭ সালের প্রথমার্ধে মওলানা ভাসানী ধাপে ধাপে প্রতিবাদী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তিনি চেষ্টা করেন শাসক দল তথা আওয়ামী লীগকে ওয়াদার প্রতি অনুগত রাখতে। না পেরে, চূড়ান্ত কর্মপন্থা হিসেবে ২৫-২৬ জুলাই ১৯৫৭ তারিখে তিনি এবং তার অনুসারীরা ঢাকায় 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন' অনুষ্ঠান করেন। সেই সম্মেলনের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ ঘঠে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামক নতুন রাজনৈতিক দলের। জন্মের পর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুর" হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব বাংলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ষাটের দশকের মধ্যভাগে ন্যাপ দু'ভাগ হয়ে যায় যথা-মস্কো পন্থী ও পিকিং পন্থী। পিকিং পন্থীদের নেতা থাকেন মওলানা ভাসানী। ন্যাপ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, যুদ্ধের পর ক্রমান্বয়ে প্রান্তিকীকরণ বা মার্জিনালাইজড হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে এর অংশগুলো অন্যান্য দলে বিলীন হয়ে যায় বা বিলীন না হলেও শীর্ণকায় হয়ে যায়।

ষাটের দশকের কর্মবহুল রাজনৈতিক ইতিহাসকে কয়েকটি বাক্যে বলার চেষ্টা করছি। পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শাসকগণ কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানের উপর যে বঞ্চনার শাসন চালায় তার বির"দ্ধে সবচেয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। এই আওয়ামী লীগ এর নেতাদের মধ্যে সার্বিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন শেখ মুজিবুর রহমান, পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু। আওয়ামী লীগই পূর্ব বাংলার মানুষকে স্বাধীকার ও পরবর্তীতে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে।

তারপর ১৯৭০ সাল এর নির্বাচন আসলো, মুক্তিযুদ্ধ আসলো ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। সেই আওয়ামী লীগ এর শাসনামলে ১৯৭২ সালে নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছিল যার নাম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। জাসদের জন্মলগ্নে কি হয়েছিল, কেন হয়েছিল আমি সেটাও দু'একটি বাক্যে তুলে ধরছি। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তর"ণ উদ্যোমী একটি দলের মতে স্বাধীন বাংলাদেশে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই ভালো হত। কিন্তু তারা দেখে যে আওয়ামী লীগ সকল দলকে বাদ দিয়ে একাই সরকার গঠন করে এবং তারা দেখে যে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকার সময়ে যে নিয়মে পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছিল ঠিক সেই নিয়মেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে। তারা অতিরিক্ত আবিস্কার করলো যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসক দলের অভ্যন্ড়রে ভিন্নমত পোষণ করার বা উপস্থাপন করার বিশেষ কোনো সুযোগ নাই। এই পেক্ষাপটেই মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেকার বিখ্যাত ছাত্র নেতা এবং মুক্তিযোদ্ধা আ.স.ম. আব্দুর রব এবং তার সংগীগণ নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে ঢাকা মহানগরের পল্টন ময়দানে তিনি উপস্থিত জনগণের সমর্থন নিয়ে অগ্রযাত্রা শুর" করেন। অক্টোবর ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জাসদ' যাত্রা শুর" করে। প্রথম সভাপতি মুক্তিযুদ্ধের ৯ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল। তাদের মূলমন্ত্র ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বাস্ড়বায়ন করতে গিয়ে ৭৩-৭৪ সালে বহু তর"ণ রাজপথে প্রাণ দেয়। চূড়ান্ড় পর্যায়ে এই ২০০৭ সালে 'জাসদ' একাধিক অংশে বিভক্ত। শক্তিশালী ক্ষমতাসীন দলের প্রতিপক্ষ হিসেবে বা বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে কত কঠিন তার প্রমাণ জাসদ।

১৯৭৪ সালের একদম শেষ দিকে ১৯৭৫ এর শুর“তেই ঘটে যায় রাজনৈতিক বিপ¬ব। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ একটি বিখ্যাত দিন। সব দল বন্ধ হয়ে যায়, নতুন দল সৃষ্টি হয় 'বাকশাল' বা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বিবেচনায় এটা করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে আমি আর কোনো মন্তব্য করবো না। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে তিনটি বছর পার হয়। অতপর দেশের তৎকালীন নতুন কা“ারী জেনারেল জিয়াউর রহমান সৃষ্টি করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। জন্ম তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। ২৪ মার্চ ১৯৮২ পর্যন্ড় এই দল প্রথম কিস্ড়িতে ক্ষমতায় ছিল। এই দলের প্রধান কৃতিত্ব বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনর্বহাল করা।

আশির দশকের মধ্যভাগে তৎকালীন সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর আগ্রহে এবং তার সরকারের প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয় জাতীয় পার্টি। জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি ১৯৮৬। জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ যে দলগুলোর জন্ম দিয়েছিলেন সেগুলো জন্ম মুহূর্তেই ছিল ক্ষমতার দোলনায়। জেনারেল এরশাদের দল ক্ষমতা থেকে চলে যায় ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে এবং এই মুহূর্তে একাধিক ভাগে বিভক্ত। বিএনপির সৌভাগ্য যে তারা দুইবার পূর্ণ মেয়াদের সরকার পরিচালনা করে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে এক ক্রান্ড়িকাল অতিক্রম করছে।

যাহোক, পাকিস্ড়ান এবং বাংলাদেশ আমলে আমরা তিনটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় পেলাম যেগুলো জনগণের কাতার থেকে এসেছিল যথা- আওয়ামী লীগ, ন্যাপ এবং জাসদ। আমরা তিনটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় পেলাম যেগুলো জন্মই হয়েছিল ক্ষমতার দোলনায় যথা বাকশাল, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি। আজ ৪ঠা ডিসেম্বর আরেকটি নতুন দল জন্ম নিচ্ছে নিশ্চিতভাবেই জনগণের কাতার থেকে এবং জনগণের জন্য। শীতকালের ফুলের বাগানে যেমন রঙ-বেরঙের অনেক ফুল থাকে, তেমনি রাজনৈতিক বাগানেও নিশ্চয়ই অনেক ফুল থাকতে পারে। জনগণ মৌমাছি, এক ফুল থেকে আরেক ফুলে ঘুরে বেড়াবে এবং বেছে নিবে কোনটি উত্তম। তারপরও, অতি সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট আমি বর্ণনা করছি কেন নতুন একটি রাজনৈতিক দল আজ জন্ম নিচ্ছে। দীর্ঘ পেক্ষাপটটি আমাদের এই দলের ঘোষণাপত্রে দেওয়া আছে, সুতরাং আমি সেটি পুনরায় পড়বো না আপনারা প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রের একটি করে কপি নিয়ে যেতে পারবেন। আমি শুধু এতটুকু বলবো যে, নব্বই এর দশকে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার পূর্ণমাত্রার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম এবং সংসদীয় গণতন্ত্র বহাল ছিল কিন্তু তার মর্ম আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি, রপ্ত করতে পারিনি। সংসদীয় গণতন্ত্রকালে দেশের উন্নতি অবশ্যই হয়েছে, প্রশাসন অবশ্যই চলেছে তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যত ভালো চলতে পারতো তত ভালো চলতে পারেনি, যত উন্নতি হতে পারতো তত উন্নতি হতে পারেনি। যতটুকু হয়েছে তার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ, যতটুকু হতে পারেনি তার জন্য আফসোস, কিন্তু আফসোস করে বসে থাকলে চলবে না আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

২০০৬ সালের অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর ছিলো একটি ক্রান্তিকাল। যে ক্রান্তিকালে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল এই দেশ, এই জনগণ কোনদিকে যাবে। জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা সরল পথে যাবে, তারা উন্নতির পথটি চাচ্ছিল। একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে যেমন সুস্থ করতে হলে অনেক সময় কঠোর চিকিৎসা করতে হয় এবং বিবিধ আরাম-আয়েস থেকে বিরত রাখতে হয় তদ্র“প এই দেশকে বাঁচানোর জন্য ২০০৬ সালের শেষ তিন মাসে এই দেশেরই জনগণ এবং সামরিক বাহিনীকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে যাকে জনপ্রিয়ভাবে মিডিয়ায় বলা হয় ওয়ান ইলেভেন (১/১১)। অর্থাৎ ২০০৭ সালের এক নম্বর মাসের ১১ নম্বর দিন। এই ওয়ান ইলেভেন আসার পর মানুষ নতুন চিন্তার বা ভিন্ন ধারার চিন্তার সুযোগ পেয়েছে। ওয়ান ইলেভেন এর মহানায়ক হচ্ছেন বাংলাদেশের স্বশস্ত্র বাহিনী এবং আরেকটি মহানায়ক হচ্ছেন বাংলাদেশের জনগণ। যে জনগণ রাজনীতি পছন্দ করে কিন্তু তারা চায় অধিকতর পরিচ্ছন্ন রাজনীতি, তারা চায় জবাবদিহিতার অবকাশ আছে এমন রাজনীতি, তারা চায় এমন একটি রাজনীতি যে রাজনীতি তাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। সমসাময়িক বিশ্বে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবলে চলবে না, অপরের সঙ্গে তাল মিলিয়েও আমাদেরকে চলতে হবে। আমরা যদি আমাদের শ্রম, আমাদের মেধা কলহে, দ্বন্দ্বে এবং সংঘর্ষেই ব্যয় করে ফেলি তাহলে উন্নতির অবকাশটা কিভাবে পাব? সেইজন্যে আমি মনে করি ১/১১ নতুনভাবে চিন্তা করার বা এগিয়ে যাবার একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে।***

এই নতুনভাবে এগিয়ে যাবার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে প্রচুর সংখ্যক অনুরোধ এবং আহ্বানের প্রেক্ষাপটে আমরা উদ্যোগী হয়েছি নতুন রাজনৈতিক দল করতে। সেই নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম আজ। এই নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য পরিবর্তন। পরিবর্তনের জন্য রাজনীতি চাই। শুধু পরিবর্তনের খাতিরে পরিবর্তন নয়, অবশ্যই অধিকতর কল্যাণ, অধিকতর উন্নতি, অধিকতর মঙ্গল, বাংলাদেশের নিজস্ব আঙ্গিনায় এবং বহিঃর্বিশ্বের সঙ্গে তুলনামূলক প্রেক্ষাপটের জন্যই এ রাজনীতি। আমরা নতুন দল। পুরনো দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বয়স প্রায় ষাট বছর, পুরনো দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর, জাতীয় পার্টির বয়স প্রায় একুশ বছর। তাদের সঙ্গে পালণ্ডা দেয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমরা তাদের পরিপূরক হতে চাই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মেধা এবং শক্তি দিয়ে তাদের ভালো দিকগুলোর পরিপূরক চেষ্টা করতে চাই এবং তাদের প্রতি আহ্বান জানাবো আমাদের ভালো দিকগুলোকে তারাও যেন পরিপূরকভাবে গ্রহণ করেন, সম্মিলিতভাবে আমরা যেন বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারি।

আজকে এই রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আমি অতি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই যে আমরা কিসের রাজনীতি করবো। আমরা সমঝোতার রাজনীতি করবো, আমরা সমন্বয়ের রাজনীতি করবো ও আমরা সহযোগিতার রাজনীতি করবো। যে সকল বিষয় বাংলাদেশের জনগণকে বিভক্ত রেখেছে সেই সকল বিষয়গুলোর সমন্বয় করত: বিভক্তি দূর করতে চাই। বিভক্তির অন্যতম স্থান হচ্ছে জাতীয় নেতৃত্ব নিয়ে বিভক্তি। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সালাম জানাই, আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুর, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টাম লীর সভাপতি মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সালাম জানাই এবং আমরা ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে প্রথমে নিজ নামে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা প্রদানকারী বা ঘোষণা পাঠকারী তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সালাম জানাই। তিন জনকেই আমরা জাতীয় নেতা মনে করি। আমরা সকলের প্রতি যার যার সম্মান প্রদান করতে চাই এবং সকলের অনুসারীর প্রতি বলতে চাই যে, ভ্রাতৃসম মমত্ব নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমরা একতাবদ্ধ হই।

দ্বিতীয়, আমাদের মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে বিভক্তি আছে আমরা বাংলাদেশী না আমরা বাঙালি, আমরা বলতে চাই আমরা উভয়ই। আমাদেরকে উভয় সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা তাত্ত্বিকভাবে দ্বন্দ্বে আছি আমরা কি ধর্মীয় পরিচয় দিব না আমরা জাতীয় পরিচয় দিব। আমরা বলতে চাই উভয় পরিচয়ই আমাদেরকে দিতে হবে। আমরা ধর্মকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবো না আবার আমরা জাতীয় পরিচয় ফেলেও এগিয়ে যেতে পারবো না। অতএব উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারীদেরকে পরিহার করতে হবে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। একদিকে আমি অভ্যাসরত মুসলমান বা খৃষ্টান বা হিন্দু বা বৌদ্ধ, অপরদিকে আমি একজন বাঙালি বা চাকমা বা গারো বা সাঁওতাল বা মারমা বা ত্রিপুরী ইত্যাদি এবং সবাই মিলে বাংলাদেশী। আমাকে এই উভয় পরিচয় নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সাবধান থাকার বিষয় হলো একটি পরিচয় যেন অন্য পরিচয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার না করে কারণ সকলেই সে আধিপত্য পছন্দ করবে না।

আমরা জনগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতা চাই। আমরা রাজনীতি করবো চারটি কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যথা- পরমত সহিষ্ণুতার সাথে, সততার সঙ্গে, দক্ষতার সাথে এবং সাহসিকতার সাথে। আমি গত তিনটি বছর ধরে চেষ্টা করেছি আমার নিজস্ব মূল্যয়ন তুলে ধরতে। দক্ষতাবিহীন রাজনীতি দেশকে এগিয়ে নিতে পারেনা আর নেতৃত্বে দক্ষতা না থাকলে অনুসারী দক্ষ হতে পারে না। যেহেতু রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই দায়িত্ব নিতে হবে দেশের ভালো মন্দের, সেজন্য তাদের দক্ষ হতে হবে, দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, দক্ষতার জন্য লেখা-পড়া প্রয়োজন এবং দক্ষতার জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। আমাদের নতুন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি এই মর্মে আহ্বান। কিন্তু মনে রাখতে হবে যেদিন মুক্তিযুদ্ধ শুর হয় সেদিন আমরা অভিজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধা পাইনি যুদ্ধ করে অভিজ্ঞ হয়েছি, একজন বিসিএস অফিসার প্রথম দিনে অভিজ্ঞ হন না চাকরি করে অভিজ্ঞ হন, একজন ব্যাংকের কর্মকর্তা প্রথম দিনে অভিজ্ঞ হন না চাকরি করে অভিজ্ঞতা পান, একজন সংসদ সদস্য প্রথম বার নির্বাচিত হয়ে অভিজ্ঞ এমপি হন, প্রথম দিনেই অভিজ্ঞ থাকেন না। তাই আমরা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভালো মানুষ পেলে তাকে দাওয়াত দিয়ে গ্রহণ করবো কিন্তু যদি অভিজ্ঞতাবিহীন ভালো মানুষ আসে, দক্ষ মেধাবী

মানুষ আসে তাকে আমরা অবশ্যই গ্রহণ করবো কারণ অভিজ্ঞতা সাময়িক ব্যাপার দু'দিন বাদেই আসবে। কিন্তু চরিত্রের সততা এবং দক্ষতা, চরিত্রের নিষ্ঠা দু'দিনের মধ্যে আসেনা এটা বহুদিনে লালিত হয়। নাম না জানা কিশোর কবি বলেছে "আকাশের যত তারা, হাত দিয়ে যায় না ধরা, না পেয়ে কেঁদে কেঁদে ভাসাইওনা বুক। বাগানের যত ফুল, বুকে তুলে নিতে করোনা ভুল; তারাই থাকবে আশে পাশে সুখে ও দুঃখে"। অনেক লোক আমাকে প্রশ্ন করে, আপনার দলে কারা কারা আছে বা থাকবে। আমি উত্তর দেই কারা থাকবে না সেটাই বরঞ্চ আপনারা প্রশ্ন কর"ন। আকাশ ভরা বিতর্কিত তারকার চেয়ে সাধারণ মানুষেরা অনেক ভালো। অতীতের সরকারগুলোতে বা সংসদগুলোতে থাকলেই উনাদেরকে নিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একটি অতি ক্ষুদ্র টিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব যারা আমিসহ পরিশ্রম করে যাচ্ছি দলটিকে জন্ম দিতে। সাদা কাগজের পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ খালি। দেশবাসীর মধ্যে যার ইচ্ছা হয় তিনি নাম লিখাবেন। আজকের পূর্বে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতার সঙ্গে কোনো গোপন চুক্তি হয়নি আমাদের নতুন দলে যোগ দেয়ার ব্যাপারে। যদিও গত দুই মাসে অনেকের সঙ্গে দেশের বিদ্যমান আইন মেনে চা-চক্রের মাধ্যমে বা ইফতার পার্টির মাধ্যমে আলোচনা হয়েছে প্রকাশ্য ও বৈধ নিয়মে। আমি এবং আমরা চাই না কোনো না কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে মিডিয়ার সামনে চমক সৃষ্টি হোক অতঃপর সেই কোনো না কোনো ব্যক্তি আবার হারিয়ে যাক। সাধারণ বাংলায় একটি কথা আছে, "গাছের আগায় তুলে মই সরিয়ে নেয়া"। অনেক লোকের আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রাজনীতিতে নামা মানে হলো গাছের আগায় ওঠা এবং সেই অনেক লোক চলে যাওয়া মানে হলো মইটা সরিয়ে নেয়া। বাংলাদেশের সমকালীন ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে আমরা এ ব্যাপারে সচেতন। আজকে আমি প্রথম দলীয় সদস্য হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করছি, দেশবাসীর প্রতি আবেদন রাখছি। আমার আবেদনের একটি জোরালো ফোকাস হচ্ছে তর"ণদের প্রতি। তর"ণদের উদ্যোম এবং প্রবীণদের পরিপক্কতা উভয়ের সম্মিলনে আমরা দেশকে এগিয়ে নিব। আমি সর্বপ্রকারের প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহমর্মীতা প্রকাশ করছি। প্রতিবন্ধীগণও দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারেন, এই অনুভূতি প্রকাশ করছি। অর্থনীতির চালিকাশক্তি ব্যবসায়ী মহলের প্রতি আবেদন করছি। পেশাজীবীগণকে বিশেষ করে কারিগরী পেশাজীবীগণকে উৎসাহিত করতে চাই, তারা যেন তাদের পেশাতেই উৎকর্ষ সাধন করেন। অবশ্যই মনে রাখতে হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা অর্থনীতি গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। তাই আজকের এই উদ্বোধনী দিনে আমাদের দলের পক্ষ থেকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার প্রকাশ করছি।

সাহসের প্রয়োজন আছে একথা বলছি এজন্যে যে, সাহসবিহীন নেতৃত্ব দেশকে এগিয়ে নিতে পারেনা, সমসাময়িক বিশ্বে পালণ্টা দিয়ে আগাতে হবে। একদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনা লাগবে অপরদিকে বিশ্বায়নের যুগে সকলের সঙ্গে সহাবস্থানের চেতনা লাগবে। তাই আমরা এই সাহসের প্রয়োজন অনুভব করি। আমাদের লক্ষ্য হবে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শক্তিশালী করা, যে সকল দুর্বলতা গত ১৫/২০ বছরে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই দুর্বলাতাগুলোকে দূর করা। আমাদের উদ্দেশ্য হবে অর্থনৈতিক কর্মকা"কে ত্বরান্বিত করা, অর্থনৈতিক কর্মকা" চলছে, চলবে। কিন্তু একটি দক্ষ রাজনৈতিক দল অনুঘটকের ভূমিকায় থেকে একে ত্বরান্বিত করতে পারে। ৩৬ বছর সময় কম না, এই ৩৬ বছরে অন্য যেকোনো নতুন ১২টি রাষ্ট্রকে যদি আমরা দেখি, সেই ১২টি নতুন রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা কতটুকু এগিয়েছি বা কতটুকু এগোয়নি এটা আমাদেরকে দেখতে হবে এবং যে সকল কারণে আগাতে পারিনি সেগুলোকে দূর করতে হবে, এর অন্যতম কারণ অবশ্যই দুর্নীতি সেটাকে কমাতে পারলে ত্বরান্বিত হবে।

বিখ্যাত গায়ক হায়দারের গান, ত্রিশ বছর পরেও আমি স্বাধীনতাটাকে খুঁজছি .....

আমাদেরকে মানবতাবাদী চেতনা গড়ে তুলতে হবে কারণ সবকিছুর পরেও পরিচয় যেটি আমাদেরকে ছাপিয়ে উঠবে যে আমরা মানুষ। এই মানুষ এবং মানুষের মৈত্রীর বন্ধন সহমর্মিতার বন্ধন আমরা এই নতুন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর মাধ্যমে গড়ে তুলতে চাই।

পৃথিবীর বহু দেশই তাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একাধিক আঙ্গিকের সংকটে পড়ে। সেই সকল সংকট থেকে তারা নিজেরাই উত্তরণ ঘটায়। বাংলাদেশও একটি সংকটকাল অতিক্রম করছে। আমাদের সংকট থেকে আমাদেরকেই বের হতে হবে। বিদেশী বন্ধুরা বা বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আমাদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে পারবে,

কারিগরী সাহায্য দিতে পারবে, বড় বড় দলীলের মাধমে পরামর্শ দিতে পারবে। এর মাধ্যমে হয়তোবা আমাদের বস্তুগত উন্নতি হবে। কিন্তু কোনো বিদেশী সাহায্য বা কোনো বিদেশী পরামর্শ আমাদের মনকে বাংলাদেশী বানাতে পারবে না, আমাদের দেশপ্রেমকে অধিকতর প্রসারিত করতে পারবে না। এটা আমাদেরকেই করতে হবে। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি এই চেষ্টা করবে। আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি নেতৃত্ব দিবে এই আস্থা আমরা পোষণ করি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ৩৬ বছর পূর্বে দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে মহান সৃষ্টিকর্তার দয়ার উপর নির্ভর করে, পুনরায় দেশের জন্য নিজের অভিজ্ঞতা, মেধা, সময় ও শ্রম উৎসর্গ করার অঙ্গিকার আজকে আপনাদের সামনে করছি। বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের আত্মসমালোচনা আমরা হয়তো একটু দেরীতেই করছি, তবুও সন্তুষ্ট যে করছি তো বটে। ইংরেজীতে বলে ইট ইজ বেটার টু বি লেইট দ্যান নেভার। আরও একটি কথা আছে। ইট ইজ নেভার টুউ লেইট টু স্টার্ট। বাংলাদেশের নবযাত্রার সূচনায় আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানাবো যখন প্রয়োজন হবে, যখন সম্ভব হবে, যখন আপনাদের ইচ্ছা হবে আমাদের ভুলত্রুটিগুলো আমাদেরকে ধরিয়ে দিবেন, আমাদেরকে নিজেদের আত্মশুদ্ধিতে সহায়তা করবেন। বাংলাদেশের মিডিয়ার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আপনারা আমাদেরকে সহায়তা করবেন, সহযোগিতা করবেন ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিতে। উদাহরণস্বরূপ আজকের বক্তব্যটার কথাই বলি, এর মধ্যে যে কথাটি আপনাদের ভালো লাগে, যে কথাটি জনগণের কাছে ভালো লাগবে, জনগণের উপকারে আসবে বলে মনে করেন সে কথাটিই তুলে ধরুন। আমরা চেষ্টা করছি নিজের মনের ভাবটি প্রকাশ করতে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নেতিবাচক কথা আমরা এখানে আনতে চাই না, কারো নেতিবাচক সমালোচনা করতে চাই না, কারো ত্রুটি আমরা তুলে ধরতে চাই না। আমরা চাই যত ভুলই করে থাকি না কেন কোনো না কোনো জায়গায় সেটিকে কবর দিতে, আর চাই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে।

অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করেছেন যে, "ব্যাপকভাবে জনগণ আপনাকে নিরপেক্ষ, স্পষ্টবাদী ব্যক্তি হিসেবে এবং বিশেণ্ডষক হিসেবে জানেন। এসব ছেড়ে আপনি কেন রাজনীতিতে আসছেন? যেখানে ছিলেন সেখানেই তো সম্মানের সাথে ভালো থাকতে পারতেন"। উত্তরে আমি একটি হাদিসের কথা বলবো। হাদীসগ্রন্থ তিরমীযী শরীফ হাদিস নম্বর ১৮৭৪ বলা আছে, "আব্দুলণ্ডাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুলণ্ডাহ (সাঃ) বলেছেন, যারা জমিনে আছেন তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতিও দয়া করবেন"। রাজনীতিকে কি মানব সেবার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না? সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে একটি কি রাজনীতি হতে পারে না? উত্তরে আরো একটু বলবো যে, আমরা সকলেই আহ্বান করছি, যেন সৎ, সাহসী, মেধাবী ব্যক্তিগণ রাজনীতিতে আসেন। কাউকে না কাউকে আহ্বান জানানোর অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। অনেকটা এরকম যে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? সম্মানিত সুধী, মনে করুন আমি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলাম। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আমার কৈফিয়ত থেকে কয়েকটি লাইন আমি উদ্বৃত করছি:

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনা'ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুঃখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো–যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

এখন দুটি শিশু আপনাদের সামনে জাতীয় কবির অন্য একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে। কবিতাটির নাম 'আমি হব'। ঐ আবৃত্তির মাধ্যমেই আপনারা উত্তর পাবেন নতুন দল কেন করা হলো এবং আমিই বা কেন রাজনীতিতে আসলাম। আবৃত্তির পর আমার বক্তব্য শেষ হবে।

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠবো আমি ডাকি;
সূর্যি মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে
হয় নি সকাল, ঘুমো এখন, মা বলবেন রেগে।
বলব আমি-আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাকো
হয় নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা কেম্‌নে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা। আসসালামু আলাইকুম।

যেহেতু বিজয়ের মাসেই নতুন রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি' ঘোষিত হচ্ছে তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি প্রাসঙ্গিক রচনা এখানে সন্নিবেশিত হলো। ঢাকা মহানগর থেকে প্রকাশিত ০১ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখের দৈনিক পত্রিকা 'আমাদের সময়'-এ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় এ রচনাটি মুদ্রিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্পূর্ণ কাজ পরবর্তী প্রজন্মের হাতে

মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক,

আজ ১ ডিসেম্বর শনিবার বিজয়ের মাসের প্রথম দিন। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরকে যদি প্রথম বার্ষিকী ধরি তাহলে এই ডিসেম্বর হচ্ছে বিজয়ের ৩৭ তম বার্ষিকী। এখনো জীবিত, সুস্থ ও সক্ষম একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ বার্ষিকীতে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানানো উচিত। ১৯৭১ সালের তর"ণ ইবরাহিম আজকে প্রৌঢ় হওয়ার পথে। তার চিন্তাভাবনাও সুনিশ্চিতভাবে তার"ণ্যের গ" পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানার ভেতরে আসন গেড়েছে। আগামী ১৬ দিন, হতে পারে মাসব্যাপী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত রচনা বের হবে। বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া, স্মৃতিচারণমূলক রচনাও বের হবে। সুতরাং বিজয় মাসের শুর"তেই সুধী পাঠকের কাছে কিছু কথা বলতে চাই।

আজকে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয়। প্রশ্ন উঠতে পারে করণীয় জীবনের কোন আঙ্গিকে? সুনিশ্চিতভাবেই আর্থিক নয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কও নয়,–তাহলে কী? আমর প্রথম নিবেদন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মূল চেতনা বা দর্শনকে পুনরায় দেশবাসীর সামনে সাদামাটা ভাষায় সুবিন্যস্ত করা। আমার দ্বিতীয় নিবেদন, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গত ৩৬ বছরে সৃষ্ট অনৈক্য সংশোধন করে যথাসম্ভব ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের একতাবদ্ধ করা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কয়েকটি আঙ্গিক ছিল, যথা–গণতন্ত্র চর্চা, ভাষা-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্যভিত্তিক অধিকার, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার স্বাধীনতা ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিতব্য অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল পৃথিবীর জাতিসমূহের আসরে একটি মর্যাদার আসন যথাসময়ে দখল করা। গত ৩৭ বছরে আমরা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়েছি সত্য, আমদানি-রপ্তানি বেড়েছে সত্য, বিভিন্ন প্রকারের ও কর্মপরিধির ব্যাংক থেকে জনগণকে দেওয়া ঋণের পরিমাণ বেড়েছে সত্য, কিন্তু সর্বোপরি মহা সত্যসমূহ হলো আনুপাতিক হারে দারিদ্র্যের সংখ্যা বেড়েছে, দেশ যতটুকু উন্নত হওয়া উচিত ছিল ততটুকু

হয়নি, ধনী ও দরিদ্রে পার্থক্য ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, সামাজিক সাম্য কোনোমতেই স্থাপিত হয়নি এবং মানসিক বা আবেগীয় ব্যাপ্তিতে আমরা এক জাতি নই। মহা সত্যসমূহের পরেও অপর নির্মমতম সত্যটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় চিন্তাচেতনা, জাতীয় দর্শন, সামাজিক দর্শন, ইতিহাস, প্রেষণা ও প্রেরণার উৎস সবকিছুতেই মার্জিনালাইজ বা প্রান্তিকরণ করা হয়ে গেছে।

মাঝেমধ্যে মনে হয় দেশ স্বাধীন করাটা কি ভুল ছিল? মাঝেমধ্যে দুশ্চিন্তা আসে একটি দুঃস্বপ্নের কথা চিন্তা করে। এর আগেও লিখেছিলাম। আমার দুশ্চিন্তাটা ছিল এই, আগামী ২০০৮, ২০০৯ বা ২০১০ এই রকম কোনো সময়ে যদি কোনো জাতীয় বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তি এই রকম বলে যে, '১৯৭১ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র ভেঙে ফেলাটা অপরাধ ছিল, অপরাধীদের খুঁজে বের করা হোক এবং তাদের বিচার করা হোক' তাহলে কী হবে? গত কয়েক মাসে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এসব নিয়ে যে কথাবার্তা হয়েছে তাতেই বোঝা যায়, আমার আশংকা পুরোপুরি মিথ্যা হয়নি। তবে নামের উপযুক্ত কোনো মুক্তিযোদ্ধা ওইরকম দুঃস্বপ্নের মতো পরিস্থিতিতেও স্বপ্নের গ ি পেরিয়ে বাস্তবতার পরিম ালে ফিরে আসবে–এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সে র খে দাঁড়াবে। পাশে যদি কেউ না থাকে সে একাই যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রয়োজনে প্রাণ দেবে। প্রয়োজনে হাজার 'বীরশ্রেষ্ঠ'-এর সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধারা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই সাহস ও আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবেন। তারপর কী হবে? জীবিত অবস্থাতেই আমরা মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যুদ্ধের নয় মাস-কালের সংঘটিত যুদ্ধগুলোর ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের চরিত্র হনন করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে—ওই বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতএব, এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে দেশপ্রেমিক ছাত্রদের ছাত্র-আন্দোলন ইতিহাস খ্যাত। বর্তমানের ছাত্রনেতাদের কাছে প্রশ্ন করি: আপনারা কি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানেন? আপনারা কি জানেন যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বা সহায়তা করেছেন? আপনাদের কি জানতে ইচ্ছে করে না—ওই ১ শতাংশ লোকা কারা, যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধিতা করেছিল? আপনাদের কি জানতে ইচ্ছে করে না তারা ১৯৭১ সালে বলেছিল–'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রয়োজন নেই, স্বাধীন বাংলাদেশ চাই না, স্বাধীনতা অর্জন করতে দেব না, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকব, পাকিস্তানি হিসেবেই মরব' ইত্যাদি। আপনারা যারা ছাত্র তাদের ওপর বিরাট এক দায়িত্ব আছে। বিশেষ করে যারা ছাত্র নেতা তাদের দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যদেরকে জানানো।

যেহেতু ছাত্ররা ছোট, যেহেতু তাদের চিন্তাশক্তি তুলনামূলকভাবে কম, যেহেতু তাদের মাথায় পড়াশোনার চাপ থাকে সেহেতু ওদের ন্যূনতমটুকু সাদামাটা ভাষায় জানা প্রয়োজন: (ক) মুক্তিযুদ্ধ কখন হয়েছিল, (খ) মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবস্থান ও পরিধি কোথায় ছিল, (গ) মুক্তিযুদ্ধের সামরিক নেতৃত্বের অবস্থান ও পরিধি কোথায় ছিল, (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছাত্রদের অবদান কী ছিল, (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কারা কারা কোন পরিচয়ে কী কী নিয়মে এর বিরোধিতা করেছিল, (চ) যারা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করেছিল, তারা কেন আজ পর্যন্ত ভুল স্বীকার করেনি বা ক্ষমা চায়নি এবং তাদের আজকের অবস্থান কোথায় ও কোন মানদ ে? এজন্য ছাত্রনেতাদের কাছে আবেদন, রাজনৈতিক সরকারের জন্য অপেক্ষা না করে আপনারা আপনাদের কর্তব্য কর ন। সর্বমহলের ছাত্রদের কাছে আবেদন, আপনারা যে যেই বড় রাজনৈতিক দলের অনুসারী হোন না কেন, ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাদের সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন এবং অপরকে জানানো প্রয়োজন।

১৯৭১ সালের এই দিনে ফিরে যাই। ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর দিবাগত রাতের আখাউড়ার প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে রাজাপুর-সিঙ্গারবিল গ্রামে শত্র অবস্থানের ওপর আক্রমণ করেছিল দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। পরের দিন আখাউড়ার দুই কিলোমিটার উত্তরে আজমপুর রেলষ্টেশনে শত্র অবস্থানের ওপর আক্রমণ করেছিল দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। তার পরের তিন দিন উত্তর দিক থেকে রেল-শহর আখাউড়াকে অবরোধ করার প্রক্রিয়ায় ন্যস্ত ছিলাম আমরা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। আখাউড়া যুদ্ধের অবসান ঘটে ৪ তারিখ অতি প্রত্যুষে শহর থেকে শত্র সেনাদের পলায়ন ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যত সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন তার সর্বশেষ কিস্তি ছিল ১ থেকে ৪ ডিসেম্বরের আজমপুর আখাউড়ার যুদ্ধে। ওই যুদ্ধে শহীদদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বি' কোম্পানীর অধিনায়ক। আমি ছিলাম একই প্রতিরক্ষা অবস্থানে পাশ্ববর্তী 'সি' কোম্পানীর অধিনায়ক। সব শহীদের কথা আজ মনে হচ্ছে তবে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই সেনাবাহিনীর বন্ধু ও সহপাঠী বদিউজ্জামানের কথা অগ্রভাগে স্মরণে আসছে। আমি আশা করি, বাংলদেশি ও বাঙালি জাতি একবার হলেও প্রশ্ন করবে কেন মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়েছিলেন?

ছাত্র ভাইয়েরা বা সন্তানসম ছাত্রছাত্রীরা, আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও নিবেদন। ১৯৭১ থেকে ২০০৭ সালের শেষপ্রান্ত, একটি প্রজন্ম বা জেনারেশন থেকেও কিঞ্চিত দীর্ঘতর সময়। আপনারা যারা অন্তত ১৫-১৬ বছর বয়স্ক, একবার ঠা"া মাথায় চিন্তা কর"ন যে মুক্তিযোদ্ধারা এই জাতিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কতটুকু করতে পেরেছে এবং বাকি কতটুকু পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অবশিষ্ট রেখেছে। গত ৩৬ বছরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি, উন্নয়ন ও পরিপক্কতা না আসার পেছনে যত কিছুই দায়ী সেটা নিয়ে বিবাদ করা যায় কিন্তু এসব থেকে বড় হলো, যেই প্রজন্ম নষ্ট হয়নি সেই প্রজন্মকে নষ্ট হতে না দেওয়া। বড় কর্তব্য হলো সেই প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা। ওয়ান ইলেভেনের পর অনুপ্রাণিত হওয়ার পরিবেশ আমরা পেয়েছি। তাই অতীতে আমরা কী পেয়েছি বা পাইনি সেটার থেকে বড় কথা, ভবিষ্যতে আমরা কী পেতে পারি সেই বিষয়ে গুর"ত্ব দেয়া। বর্তমান প্রজন্ম যারা ত্রিশ-নিম্ন, তারা কী পেতে পারে বা কী পাওয়া উচিত—সেটার ওপর গুর"ত্ব আরোপ করা। আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে গুলি করে আমাদেরকে মেরে ফেলার শত্র" হয়তো আমরা পাব না, কিন্তু আমাদের শত্র" হয়ে দাঁড়াবে ধর্মান্ধতা, মূর্খতা। এজন্য আমাদেরকে সতর্ক হয়ে পদক্ষেপ নেয়ার সময় কিন্তু এখনই।